ইউনিট ৬

গবাদিপশুর খাদ্য ও পুষ্টি

এ কথা সবাই জানে যে, কোন প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ছাড়াও পুষ্টিসাধন ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্যও সুষম খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এ খাদ্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজ উভয় উৎস থেকেই পাওয়া যেতে পারে। একটি প্রাণি তার দেহের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। এ সকল পুষ্টি উপাদানের মধ্যে শর্করা, আমিষ, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, খণিজপদার্থ ও পানি উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি পুষ্টি উপাদান দেহের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শ্বেতসার বা শর্করা দেহে শক্তি যোগায়, আমিষ দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত কলার পূর্ণগঠনে ও দৈহিক বৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে। অন্যদিকে, খণিজপদার্থ দেহের কাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এর গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। কারণ ভিটামিন দেহের জৈবিক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদান দেহের যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। এই উপদানগুলো চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত ও সঠিক অনুপাতে সরবরাহ না করলে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি তথা প্রাণির উৎপাদন ব্যাহত হবে। একজন সফল খামারিকে খাদ্যের এ পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খাদ্যতালিকা বা রেশন তৈরিতে বেশ সুবিধা হবে।

ইউনিট ৬-এর বিভিন্ন পাঠে খাদ্য, পুষ্টি ও খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস; গবাদিপশুর খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া; বিভিন্ন জাতের খাদ্যের উৎপাদন কৌশল এবং গবাদিপশুর খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলাচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১

গবাদিপশুর খাদ্য, পুষ্টি ও খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খাদ্য ও পুষ্টি কী তা বলতে পারবেন।
- খাদ্যের গঠন ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।
- খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে পুষ্টি উপাদানসমূহের শ্রেণিবিভাগ করে দেখাতে পারবেন।

প্রাণী অর্থ্যাৎ গবাদিপশু ও পোল্ট্রি তার দৈহিক বৃদ্ধি, দুধ, মাংস, পশম, পালক, ডিম ও বাচ্চা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান খাদ্য থেকেই পেয়ে থাকে। খাদ্য ও পুষ্টি কী তা নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

খাদ্য

সাধারণভাবে খাদ্য বলতে যে কোনো ভোজ্য দ্রব্যকেই বোঝানো হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় খাদ্য হলো সেসব দ্রব্য যা প্রাণি আহার হিসেবে গ্রহণ করে এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের পর তা দেহে ব্যবহৃত হয়। যেমন– ঘাস, খৈল, ভূষি ইত্যাদি।

পুষ্টি

এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি প্রাণির খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের মাধ্যমে দৈহিক বৃদ্ধি, উৎপাদন ও প্রজননে সাহায্য করে এবং বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে।

পুষ্টি উপাদান

এটি এমন একটি দ্রব্য যা কোনো একটি কোষ তথা প্রাণির দৈহিক বৃদ্ধি, দেহরক্ষা, প্রজনন ও দেহের অন্যান্য কার্যক্রমে সাহায্য করে। পুষ্টি উপাদানকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– আমিষ, শর্করা, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, খণিজপদার্থ ও পানি।

খাদ্যের কাজ

খাদ্যের প্রথম ও অত্যাবশ্যকীয় কাজ হলো প্রাণির জীবন রক্ষা করা। এছাড়াও খাদ্য নিম্নলিখিত কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যেমন–

- প্রাণিদেহের ক্ষয় রোধ করা।
- দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
- দৈহিক বৃদ্ধি সাধন ও ভারসাম্য রক্ষা করা।
- উৎপাদন ক্ষমতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা (গবাদিপশুর ক্ষেত্রে মাংস এবং পোল্ট্রির ক্ষেত্রে ডিম ও মাংস উৎপাদন)।
- দেহ থেকে বিষাক্ত পদার্থ নির্গমনে সাহায্য করা।

গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খাদ্য মূলত উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জজাত। তবে কিছু কিছু প্রাণিজ উৎস, যেমন– ফিস মিল (Fish meal), ব্লাড মিল (Blood meal) ইত্যাদিও সীমিত আকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ এবং প্রাণি একই ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ধারণ করে। প্রবাহচিত্র ১-এ কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হয়েছে।

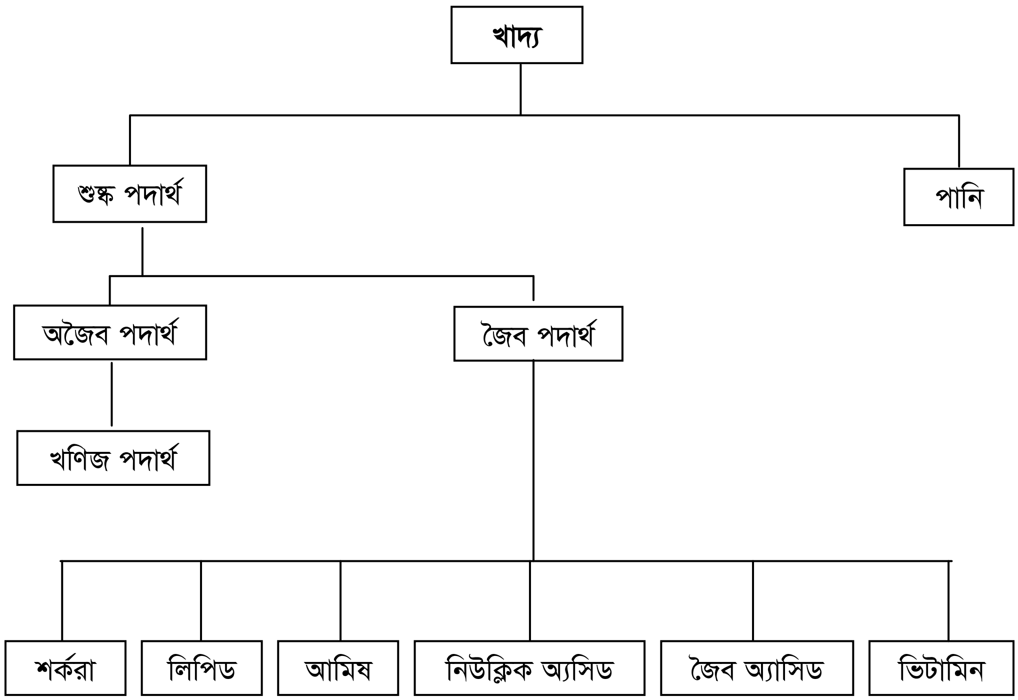

প্রবাহচিত্র ৬.১.১: খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস

পানি

গবাদিপশু তথা প্রাণিদেহের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সাধারণত তিনটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। যেমন– ক) খাবার পানি- এটি বাইরে থেকে প্রাণিদেহে সরবারহ করা হয়, খ) খাদ্যের মধ্যে বিদ্যমান পানি- প্রাণি যেসব খাবার গ্রহণ করে তা থেকে প্রাপ্ত পানি এবং গ) বিপাকীয় পানি- দেহের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পানি। প্রাণী যেসব খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তাতে বিদ্যমান পানির পরিমাণ খাদ্যের ধরনভেদে বেশ তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন- শুষ্ক খাদ্যের মধ্যে ১০০-১৫০ গ্রাম/কেজি এবং রসালো খাদ্যের মধ্যে ৬০০-৮০০ গ্রাম/কেজি পানি পাওয়া যায়। পানি দেহে দ্রাবক হিসেবে কাজ করে যার মাধ্যমে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান পরিবাহিত হয়। তছাড়া পানি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও দেহাভ্যন্ড়রের বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণে সাহায্য করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণির ক্ষেত্রে আমিষ হচ্ছে নাইট্রোজেন বহনকারী যৌগ।

শুষ্ক পদার্থ

খাদ্যের শুষ্কপদার্থ দু'ভাগে বিভক্ত; জৈব ও অজৈব যৌগ। কিছু কিছু জৈব যৌগ তার গাঠনিক উপাদান হিসেবে খণিজ উপাদান ধারণ করে। যেমন– সকল ধরনের আমিষ সালফার ধারণ করে, কিছু কিছু লিপিড ও শর্করা ফসফরাস ধারণ করে। সকল উদ্ভিদ এবং অনেক বীজে শুষ্ক পদার্থের প্রধান উপাদানই হচ্ছে শর্করা। অন্যদিকে, প্রাণিজ খাদ্যে শর্করার পরিমাণ খুবই কম। এর প্রধান কারণ হলো প্রাণিজ কোষপ্রাচীর মূলত: আমিষ দিয়ে গঠিত। পক্ষান্তরে, উদ্ভিদের

কোষপ্রাচীর মূলত সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। তাই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে শর্করা গাঠনিক ও সঞ্চিত পদার্থের উৎস হিসেবে কাজ করে। কিন্তু প্রাণিতে এটি শুধু গাঠনিক উপাদান হিসেবেই কাজ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণির ক্ষেত্রে আমিষ হচ্ছে নাইট্রোজেন বহনকারী যৌগ। আবার উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আমিষই এনজাইম হিসেবে উপস্থিত থাকে। কিন্তু প্রাণির ক্ষেত্রে মাংসপেশী, চুল, চামড়া, পালক, পশম ও নখে আমিষ বিদ্যমান। ছাই বা অ্যাস-এ (Ash) গৌন (Micro) ও মূখ্য (Macro) খণিজ উপাদান থাকে। চর্বি একটি গুরুত্বপূর্ণ লিপিড বা স্নেহজাতীয় উপাদান। উদ্ভিদ ও প্রাণি উভয়ের মধ্যেই এটি বিদ্যমান। তবে উদ্ভিদের মধ্যে চর্বির পরিমাণ প্রাণিদেহের থেকে কম থাকে। উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় সবগুলো ভিটামিনই সংশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু প্রাণি তা পারে না। লিগিউমজাতীয় উদ্ভিদে বেশি পরিমাণে কার্বন সিরিজ পাওয়া যায়।

খাদ্যতালিকা বা রেশন

কোন প্রাণিকে পুরো দিনে অর্থ্যাৎ ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাকে খাদ্যতালিকা বা রেশন (Ration) বলে। খাদ্যতালিকা বা রেশন দুই প্রকার। যথা–

- দেহরক্ষাকারী খাদ্যতালিকা (Maintenance Ration)
- উৎপাদন খাদ্যতালিকা (Production Ration)

উৎপাদন মাত্রা বেশি হলে একই দৈহিক ওজনবিশিষ্ট প্রাণির উৎপাদন রেশনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

প্রাণি যখন বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে (অর্থাৎ যখন কোনো কাজ করে না) তখন যে রেশন প্রদান করা হয় তাকে দেহরক্ষাকারী রেশন বলে। অন্যদিকে, প্রাণিকে যখন দেহরক্ষাকারী রেশনের সাথে তার উৎপাদন যেমন– দৈহিক বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন, গর্ভাবস্থা, হালচাষ প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত রেশন সরবরাহ করা হয় তখন সে রেশনকে উৎপাদন রেশন বলে। এটি প্রাণির দৈহিক ওজন ও উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। উৎপাদন মাত্রা বেশি হলে একই দৈহিক ওজনবিশিষ্ট প্রাণির উৎপাদন রেশনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য

- একটি আদর্শ রেশন বা খাদ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকবে।
- খাদ্যতালিকায় ব্যবহৃত উপকরণ অবশ্যই সুস্বাদু হবে।
- খাদ্যতালিকায় যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ উপকরণ যোগ করা উচিত।
- খাদ্যতালিকার খাদ্য উপকরণগুলোতে কোন বিষাক্ত পদার্থ থাকবে না।
- খাদ্যতালিকা বা রেশন অবশ্যই রেচক (Laxative) হবে।
- খাদ্যতালিকা বা রেশন আয়তনে বেশি হবে (Bulky) ।
- খাদ্যতালিকায় বেশির ভাগ সবুজ ফডার (Fodder) বা কাঁচা ঘাসজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করা উচিত।
- হঠাৎ করে খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন আনা যাবে না।
- প্রতিদিন একই সময়ে রেশন সরবরাহ করতে হবে।
- রেশন তৈরির সময় অর্থনৈতিক দিক খেয়াল রাখতে হবে।
- একই জাতের ও একই বয়সের প্রাণিদের একই রেশন সরবরাহ করতে হবে।
- খাদ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় খণিজ উপাদান বিদ্যমান থাকবে।

খাদ্যতালিকা বা রেশন তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়

যে কোনো প্রাণির জন্য খাদ্যতালিকা বা রেশন তৈরি করতে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

- খাদ্যতালিকা বা রেশন তৈরির উদ্দেশ্যে কী তা জানতে হবে।
- কোন বয়সের প্রাণির জন্য খাদ্যতালিকা তৈরি করা হবে তা জানতে হবে।
- প্রাণিটি উৎপাদনের কোন স্তরে আছে তা জানতে হবে।
- প্রাণিটির অসুস্থ হওয়া চলবে না।
- খাদ্যতালিকা বা রেশনে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণগুলোর রাসায়নিক গঠন জানতে হবে।
- খাদ্য উপকরণে শক্তির হিসাব জানতে হবে।
- খাদ্য উপকরণ সস্তা ও সহজলভ্য হতে হবে।
- খাদ্য উপকরণে কোনো বিষাক্ত (Toxic) পদার্থ আছে কি-না তা জানতে হবে।
- প্রাণির দৈহিক ওজন জানতে হবে।
- প্রয়োজনীয় ভিটামিনসম্মৃদ্ধ খাদ্য উৎস অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য অপরিহার্য।

সুষম খাদ্য (Balanced Diet)

সুষম খাদ্য বলতে সেসব খাদ্যকে বোঝায় যা গ্রহণ করলে দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য অপরিহার্য।

খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical Analysis of Food)

হেনিবার্গ (Henneberg) এবং ষ্টোহম্যান (Stohmann) নামে দু'জন জার্মান বিজ্ঞানী ১৮৬৪ সালে খাদ্যের ধারাবাহিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেগুলোর সাধারণ গুণাবলী একই ধরনের, সেগুলোকে একই দলের অন্তর্ভূক্ত করে বিশ্লেষণের কথা বলা হয়েছে। এসব পুষ্টি উপাদানকে সমীপতম বা প্রক্সিমেট (Proximate) উপাদান বলে। সমীপতম বিশ্লেষণের ভিত্তিতে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

<u>**উপাত্ত**</u> — <u>**পুষ্টি উপাদান**</u>

জলীয় অংশ: পানি (এবং উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিড ও ক্ষার)

ছাই বা অ্যাস:

- প্রয়োজনীয় উপাদন →
  - মূখ্য– ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, সালফার, ফসফরাস, ক্লোরিণ।
  - গৌণ– লোহা, কপার, কোবাল্ট, জিংক, আয়োডিন, মলিবডেনাম, সেলেনিয়াম ইত্যাদি।
- অপ্রয়োজনীয় উপাদন — বোরন, সিসা, অ্যালুমিনিয়াম

অশোধিত আমিষ:	আমিষ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যামাইনস, নাইট্রেট, গ্লাইকোলিপিড, ভিটামিন-বি, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি।
ইথার নির্যাস:	চর্বি, তেল, মোম, জৈব অ্যাসিড, রঞ্জক, স্টেরল, ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে।
অশোধিত আঁশ:	সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন ইত্যাদি।
নাইট্রোজেনবিহীন নির্যাস:	চিনি, শর্করা, পেকটিন, জৈব অ্যাসিড, ট্যানিন, রঞ্জক, পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ইত্যাদি।

উপরোক্ত উপাদানগুলো গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

খাদ্যের আর্ন্তজাতিক শ্রেণিবিন্যাস

- **শুকনো ফরেজ ও রাফেজ–** এই শ্রেণিতে সব ধরনের ফরেজ (Forage) ও রাফেজ (Roughage) অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্য যেগুলোতে ১৮%-এর বেশি আঁশ (fiber) বা ৩৫% কোষপ্রাচীর আছে সেগুলোও এ শ্রেণির অর্ন্তভূক্ত। ফরেজ, রাফেজ ও হে (Hay) (লিগিউম ও ননলিগিউম), খড়, ভূট্টা, ইত্যাদি যেগুলোতে শক্তির পরিমাণ কম থাকে, সেগুলোও এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। এর কারণ এদের কোষপ্রাচীরের আয়তন বেশি।
- **চারণভূমির ঘাস ও গাছের পাতা –** সব ধরনের ফরেজ খাদ্য ও গাছের পাতা এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত।
- **সাইলেজ (Silage)**
- **শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য–** যেসব খাদ্যদ্রব্যে আঁশ ও টিডিএন (TDN- Total Digestible Nutrients)-এর পরিমাণ যথাক্রমে ১৮%-এর কম ও ৬০%-এর বেশি সেগুলোও এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। যেমন– দানাদার ও তাদের উপজাত খাদ্যদ্রব্য।
- **আমিষ সম্পূরক–** যেসব খাদ্যে আমিষের পরিমাণ ২০% সেগুলো এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত।
- **খণিজ সম্পূরক (Mineral Supplement)**
- **খাদ্যপ্রাণ সম্পূরক (Vitamin Supplement)**
- **খাদ্য সংযোজক (Feed Additives)**

পশুখাদ্য উপকরণের শ্রেণিবিভাগ

প্রবাহ চিত্র ৬.১.২-এ গবাদিপশুর খাদ্য উপকরণসমূহের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হয়েছে।

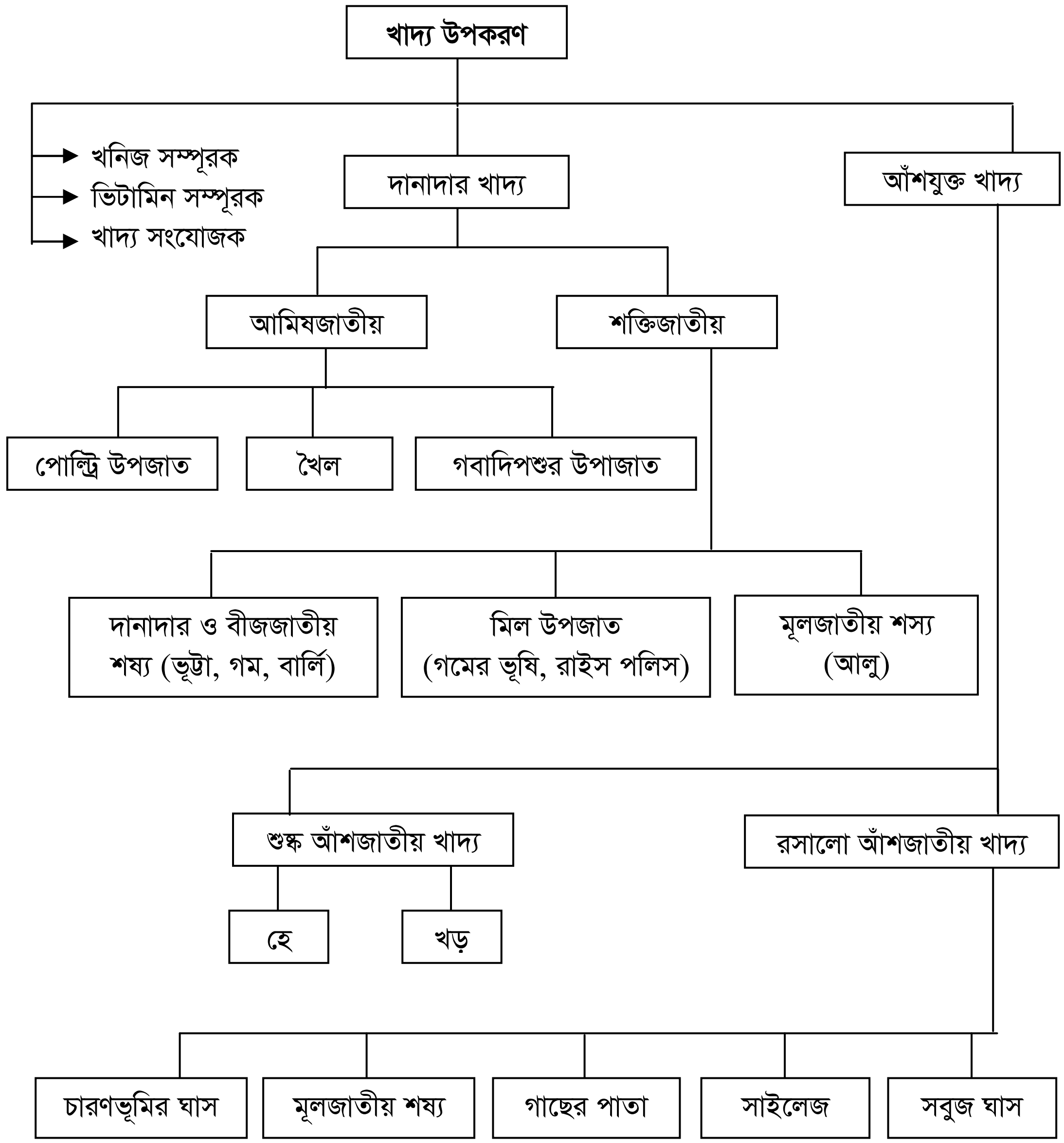

প্রবাহচিত্র ৬.১.২: গবাদিপশুর খাদ্য উপকরণসমূহের শ্রেণিবিভাগ

সারমর্ম

খাদ্যের অন্যতম প্রধান কাজ হলো প্রাণীর জীবণ রক্ষা করা। খাদ্য প্রানীদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সবক'টি পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে যা থেকে প্রাণী শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। খাদ্য দেহের বিভিন্ন ধরনের জৈবিক কাজ ও দেহের রোগ প্রতিরোধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও দেহ মধ্যস্থিত বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যপদার্থ নিঃসরণেও খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি জৈব পদার্থ নয়?
ক) শর্করা
খ) লিপিড
গ) আমিষ
ঘ) ক্যালসিয়াম

২. রেশন কত প্রকার?
ক) ২ প্রকার
খ) ৩ প্রকার
গ) ৪ প্রকার
ঘ) ৫ প্রকার

৩. হেলিসবার্গ ও ষ্টোম্যান কোন দেশের বিজ্ঞানী?
ক) জার্মান
খ) রাশিয়ান
গ) আমেরিকান
ঘ) যুক্তরাজ্য

পাঠ ৬.২

গবাদিপশুর খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিপাক কী তা বলতে পারবেন।
- পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনকারী বিভিন্ন এনজাইমের নাম ও তাদের কার্যাবলী বলতে ও লিখতে পারবেন।

প্রাণির পরিপাকতন্ত্র অর্থাৎ পরিপাক নালী ও পরিপাক গ্রন্থির সামগ্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে জটিল খাদ্যদ্রব্যকে ভেঙ্গে সরল ও শোষণযোগ্য অবস্থায় উপনীত করা এবং শোষণের পর বর্জ্য পদার্থ দেহের বাইরে অপসারণ করার প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে। অন্য কথায়, পরিপাক হচ্ছে এমন একটি যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা পরিপাক নালীতে গৃহীত খাদ্যবস্তু এনজাইম বা অনুঘটকের ও অনুজীবের সাহায্যে ভেঙ্গে শোষণযোগ্য সরল খাদ্যে পরিণত করে। এখানে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলতে খাদ্যবস্তু ধরা, গলধকরণ করা, জাবর-কাটা প্রভৃতিকে বোঝায়। আর রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলতে অনুঘটক ও অনুজীবের কার্যাবলীকে বোঝানো হয়েছে। অনুজীবীয় পরিপাক গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রির (Poultry) চেয়ে রোমন্থক (Ruminants) বা জাবর-কাটা প্রাণিতে (যেমন- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি) বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা রুমেন-এ (Rumen- রোমন্থক প্রাণীর প্রথম পাকস্থলী) অনুজীবীয় পরিপাক (Microbial digestgion) হয়ে থাকে।

সরল পাকস্থলীসম্পন্ন প্রাণী (Monogastric animal) ও পোল্ট্রি এবং রোমন্থক প্রাণির পরিপাকতন্ত্রের গঠনের পার্থক্যের জন্য এদের পরিপাক প্রণালীতেও কিছুটা ভিন্নতা থাকে। এ পাঠে উভয় ধরনের প্রাণির পরিপাক প্রণালীই বর্ণনা করা হয়েছে।

পোল্ট্রি ও সরল পাকস্থলীসম্পন্ন প্রাণী

পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), পেপসিনোজেন, পানি, মিউকাস ও অ্যামাইলেজ বিদ্যমান।

মুখের ভিতর খাদ্য গ্রহণের পর তা প্রথমে লালার সঙ্গে মিশ্রিত হয়। লালায় উপস্থিত টায়ালিন নামক এক প্রকার এনজাইম বা অনুঘটক পলিস্যাক্যারাইড ও শর্করা বা স্টার্চজাতীয় খাদ্যের উপর ক্রিয়া করে তাকে মাল্টোজে পরিণত করে। এখানে খাদ্য খুব অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয় বলে মাত্র ৩-৫% শর্করা খাদ্য পরিপাক হয়। অতঃপর খাদ্যবস্তু অন্ননালী হয়ে খাদ্যথলি বা ক্রপে (Crop) জমা হয়। পাকস্থলী থেকে পাচক রস (Gastric juice) নিঃসৃত হয়। পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), পেপসিনোজেন, পানি, মিউকাস ও অ্যামাইলেজ বিদ্যমান। পেপসিনোজেন পেপসিনে রূপান্তরিত হয়ে আমিষজাতীয় খাদ্যকে প্রোটিওজে পরিণত করে। পাকস্থলী থেকে এই অর্ধ-পরিপাককৃত খাদ্য পরিশেষে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্তের ডিওডেনাম নামক অংশ থেকে কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না। কিন্তু এরা খাদ্যদ্রব্য

পিচ্ছিল করে এবং শ্লেষ্মা বা মিউকাসকে শক্তিশালী অ্যাসিডের হাত থেকে রক্ষা করে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার এনজাইমের খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

এনজাইম	**যার ওপর ক্রিয়া করে**	**উৎপাদন**
গ্যাসট্রিক রস		
ট্রিপসিন →	আমিষ →	পেপটোনস
কাইমোট্রিপসিন	পেপটোনস	অ্যামাইনো অ্যাসিড
	পেপটাইডস	
অগ্নাশয় রস		
অ্যামাইলেজ →	স্টার্চ, ডেক্সট্রিন →	মনোস্যাকারাইড, গ্লুকোজ
কার্বক্সিপেপটিডেজ →	পেপটাইডস →	অ্যামাইনো অ্যাসিড
কোলেস্টেরল এস্টারেজ →	কোলেস্টেরল →	ফ্যাটি অ্যাসিড
বাইল →	ফ্যাট →	ফ্যাটের ইমালশন
লাইপেজ →	ফ্যাট →	ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল
ক্ষুদ্রান্ত্রের রস		
পেপটিডেজ →	পেপটাইডেজ →	অ্যামাইনো অ্যাসিড, ডাই পেপটাইলেজ
সুক্রেজ →	সুক্রোজ →	গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ
মাল্টেজ →	মাল্টোজ →	গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ
ফলিনিউক্লিওটাইডেজ →	নিউক্লিক অ্যাসিড →	মনোনিউক্লিডটাইডেজ
লেকটেজ →	ফ্যাট →	ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল

সিকাতে অনুজীবের খাদ্য পরিপাক অনুজীব →	সেলুলোজ	উৎপাদন
	পলিস্যাকারাইড	অনুজীবীয় আমিষ
	স্টার্চ	ভিটামিন বি
	চিনি	ভিটামিন কে

অধিকাংশ পুষ্টি উপাদসমূহ ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের (Villi) মাধ্যমে দেহে শোষিত হয়ে রক্তস্রোতের মাধ্যমে কোষে পৌঁছে।

অধিকাংশ পুষ্টি উপাদসমূহ ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের (Villi) মাধ্যমে দেহে শোষিত হয়ে রক্তস্রোতের মাধ্যমে কোষে পৌঁছে। তবে কিছু উপাদান, যেমন– সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ ইত্যাদি, পোল্ট্রির ক্ষেত্রে পরিপাক হয় না ফলে বৃহদান্তে চলে যায়। বৃহদান্ত্রের সিকাম ও কোলনে কিছু অনুজীবের ক্রিয়ায় অবশিষ্ট খাদ্যের পরিপাক সম্পন্ন হয় ও পরে তা দেহে শোষিত হয়।

রোমন্থক প্রাণীর খাদ্য পরিপাক

রোমন্থক ও অ-রোমন্থক (Monogastric) প্রাণির পরিপাক প্রক্রিয়ার প্রধান পার্থক্য হলো রোমন্থক প্রাণীর রুমেনে খাদ্যবস্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় এবং অনুজীবীয় পরিপাক হয় যা অ-রোমন্থক মনোগ্যাষ্ট্রিক প্রাণিতে দেখা যায় না। এখানে রোমন্থক প্রাণির দেহে শর্করা, আমিষ ও চর্বির পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

রোমন্থক প্রাণিতে শর্করার পরিপাক

১. মুখে পরিপাক

খাদ্যবস্তু যখন মুখে গ্রহীত হয় তখন তা উত্তমরূপে চর্বিত ও পেষিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। মুখ থেকে নিঃসৃত লালার মধ্যে টায়ালিন এনজাইম থাকার কারণে এখানে শর্করাজাতীয় খাদ্যের কোন পরিপাক হয় না।

২. রুমেনে পরিপাক

সব ধরনের শর্করা রুমেনে অনুজীবের এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে।

> সব ধরনের শর্করা রুমেনে অনুজীবের এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে।

৩. ক্ষুদ্রান্তে শর্করা পরিপাক

ক. ডিউডেনাম– ডিওডেনামে শর্করা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। এখানেই অগ্নাশয় রস খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এ অগ্নাশয় রসে প্রচুর পরিমাণে α-অ্যামাইলেজ থাকে। এই α-অ্যামাইলেজ লালার অ্যামাইলেজের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং শর্করাগুলোকে ভেঙ্গে মাল্টোজ ও আইসোম্যাল্টোজে পরিণত করে।

খ. জেজুনাম– এরপর ক্ষুদ্রান্তের ইপিথেলিয়াল কোষ থেকে ল্যাক্টেজ, ম্যাল্টেজ, সুক্রেজ, আইসোম্যাল্টেজ নামক এনজাইম, ল্যাক্টোজ, সুক্রোজ, আইসোম্যাল্টোজ ডাইস্যাকারাইডসমূহকে তাদের সংশ্লিষ্ট মনোস্যাকারাইডে রূপান্তরিত করে।

গ. ইলিয়াম– এখানে সাধারণত কোনো পরিপাক হয় না। তবে কখনো শর্করা ভেঙ্গে মনোস্যাকারইডে পরিণত না হলে ও ইলিয়ামে এনজাইম থাকলে সামান্য পরিপাক ঘটতে পারে। তবে এ অংশে প্রধানত পরিপাককৃত খাদ্যের শোষণ ঘটে থাকে।

আমিষের পরিপাক

রুমেনের অনুজীব প্রোটিওলাইটিক এনজাইম উৎপন্ন করে যা খাদ্যের আমিষকে আর্দ্র-বিশ্লেষিত করে পেপটাইডস ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। এগুলোর মধ্যে কোন কোনগুলোর গুণ নষ্ট (Denatured) হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। কোন কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড অনুজীব দিয়ে সরাসরি ব্যবহৃত হয় তাদের নিজেদের জন্য। অ্যামোনিয়া হচ্ছে রুমেনের প্রধান দ্রবীভূত নাইট্রোজেনজাতীয় পদার্থ যার কিছু অংশও অনুজীবের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা অনুজীবীয় আমিষ সংশ্লেষণে সাহায্য করে। রোমন্থক প্রাণির রুমেনে অ্যামোনিয়ার ঘনত্ব রুমেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন– আমিষের দ্রবণীয়তা, আমিষের পরিমাণ, রুমেনের pH, অনুজীবের সংখ্যা ইত্যাদি।

> অ্যামোনিয়া হচ্ছে রুমেনের প্রধান দ্রবীভূত নাইট্রোজেনজাতীয় পদার্থ।

রুমেনের অধিকাংশ অ্যামোনিয়া ওখানকার প্রাচীর দিয়ে শোষিত হয়ে থাকে। এ অ্যামোনিয়া যখন যকৃতে যায় তখন সেখানে এটি ইউরিয়াতে রূপান্তরিত হয়। এ ইউরিয়ার বেশির ভাগই মূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটি নিচে প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

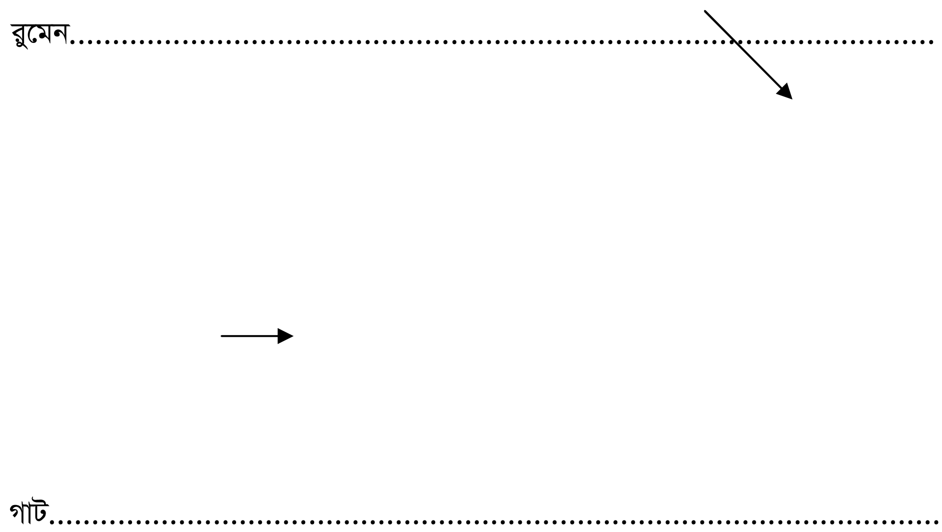

প্রবাহচিত্র ৬.২.১: রোমন্থক প্রাণিদেহে নাইট্রোজেনজাতীয় পদার্থের পরিপাক

সারমর্ম

প্রাণী খাদ্য খাওয়ার পর তা পরিপাকতন্ত্রের ভিতরে বিভিন্ন এনজাইম ও অনুজীবের মাধ্যমে পরিপাক হয়ে থাকে। রোমন্থক প্রাণিদের ক্ষেত্রে পাকস্থলীর প্রথম প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ রুমেনে অনুজীবের মাধ্যমে অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সরল পাকস্থলীসম্পন্ন মনোগ্যাস্ট্রিক প্রাণিদের পরিপাকতন্ত্রে কোন অনুজীব না থাকায় অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক হয়। তাছাড়া রোমন্থক প্রাণিদের পাকস্থলী চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত যা সরল পাকস্থলীসম্পন্ন প্রাণিতে দেখা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি পাকস্থলীর প্রথম প্রকোষ্ঠ?
ক) রুমেন খ) রেটিকুলাম
গ) ওমেজাম ঘ) এবোমেজাম

২. সুক্রোজ ভেঙ্গে কী হয়?
ক) গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ খ) ফ্যাটি অ্যাসিড
গ) অ্যামাইনো এসিড ঘ) ফ্যাট

৩. কোন অংশে সাধারণত শর্করার কোন পরিপাক হয় না?
ক) ইলিয়াম খ) জেজুনাম
গ) ডিওডেনাম ঘ) খ ও গ

পাঠ ৬.৩

বিভিন্ন জাতের খাদ্যের উৎপাদন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য ঘাস কী তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- ফরেজ-এর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের গোখাদ্য ও ঘাসের উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

ঘাস বলতে আঁশজাতীয় গো-খাদ্যকে বোঝানো হয়। ইংরেজিতে এগুলোকে ফরেজ (Forage) বলে। ‘ফরেজ’ শব্দটি দিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত বা চাষকৃত ডাল (Legume) ও অ-ডাল (Non-legume)-জাতীয় ঘাস বা গাছের পাতা (Tree leaves), যেগুলো গাবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তার সবগুলোকেই বোঝায়। তবে এগুলোর মধ্যে যেসব ঘাস চাষ করে উৎপাদন করা হয় তাদেরকে ‘ফডার ক্রপ’ বা সংক্ষেপে ফডার (Fodder) বলে আখ্যায়িত করা যায়। জাত, খাদ্য গুণাগুণ, চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ফরেজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। জাতভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের একটি নমুনা নিচের প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

ফরেজ (Forage)

অ-ডালজাতীয়	ডালজাতীয়	গাছের পাতাজাতীয়
নেপিয়ার	খেসারি	ইপিল ইপিল
ভুট্টা	মাসকালাই	মালবেরি
সারগম	কাউপি	শেওড়া পাতা
প্যারা	ধৈঞ্চা	ডুমুর পাতা
ওট ইত্যাদি	বারসিম ইত্যাদি	গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি

প্রবাহচিত্র ৬.৩.১: ফরেজের জাতভিত্তিক শেণিবিভাগ

বীজ সংগ্রহের পর ভূট্টা গাছের সবুজ ও নরম অংশ সরাসরি গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

উপরোক্ত বিভিন্ন জাতের ঘাসের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু জাতের ঘাসের উৎপাদন কৌশল এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভুট্টা (Zea mays)

গো-খাদ্য হিসেবে ভূট্টার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। ভূট্টাগাছ ফডার ক্রপ হিসেবে যেমন উন্নতমানের তেমনি বীজ ও শস্যদানা হিসেবে পশুপাখির জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য। বীজ সংগ্রহের পর

ভূট্টা গাছের সবুজ ও নরম অংশ সরাসরি গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় বা সাইলেজ (Silage) তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়।

জাত

বর্ণালী, মোহর ও প্যাসিফিক–১১ (হাইব্রিড জাত) ইত্যাদি।

জমি ও আবহাওয়া

পানি নিষ্কাশণের সুযোগসহ দোঁ-আশ বা এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে সারা বছরই ভূট্টার চাষ করা যায়। পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করলে বেলে দো-আঁশ মাটিতেও ভূট্টা উৎপাদন করা সম্ভব। মাটির পিএইচ (pH) ৬.৫-৭.০-এর মধ্যে থাকা বাঞ্চনীয়। প্রথমে মাটি কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে ছোট করতে হবে। চাষের সময় গোবর ও কৃত্রিম সার, যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) ও এমপি (মিউরেট অব পটাশ)-এর প্রথম ডোজ বা অর্ধেক পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট অর্ধেক কৃত্রিম সার শুষ্ক মৌসুমে ৪৫-৬০ দিনে ও বর্ষা মৌসুমে ৩০-৪০ দিনে ভূট্টা ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। ফডার শস্য হিসেবে হেক্টরপ্রতি ৫০-৫৫ কেজি ভূট্টাবীজ প্রয়োজন হবে। বর্ণালী ও মোহর জাতের ভূট্টা এদেশে বেশ জনপ্রিয়। তবে হাইব্রিড ভূট্টার (প্যাসিফিক–১১) ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি প্রয়োজন ।

বপন প্রনালী

বীজ সাধারণত ছিটিয়ে ও সারি করে বপন করা হয়।

ভূট্টা ফডার কাটার সময় ও ফলন

ভূট্টা ফডার দানা নরম অবস্থায় (Milk stage) সাধারণত বপনের ৭০-৮০ দিন পর কাটতে হয়। বছরে ৪টি শস্য উৎপাদন করলে হেক্টরপ্রতি ৮০-৯০ টন ফডার উৎপাদন সম্ভব। হাইব্রিড ভূট্টার উৎপাদন হেক্টরপ্রতি ১২৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

সরগাম (Sorghum)

জাত

সুইট সরগাম, পাইপার সুদান, জাম্বু (হাইব্রিড) ইত্যাদি।

মাটি ও আবহাওয়া

বেলে দো-আঁশ বা এঁটেল দো-আঁশ মাটি সরগাম চাষের জন্য উপযোগী। মাটির পিএইচ ৬.৫-৭.০ থাকা প্রয়োজন। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। তবে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ৩০° সেলসিয়াস (সে.) থেকে ৩৪° সে. তাপমাত্রায় এবং ৪০-৭৫ সেন্টিমিটার (সেমি) বৃষ্টিপাতে সরগামের ভালো ফলন পাওয়া যায়।

ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ কেজি ও সারি করে বপনের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ১০-১৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপনের পদ্ধতি

সারি করে বা ছিটিয়ে বপন করা যায়।

সার প্রয়োগ

মাটি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঝরঝরে করে হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ টন গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ কেজি ও সারি করে বপনের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ১০-১৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। গোবর প্রয়োগ করলে হেক্টরপ্রতি ৬০-৫০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টিপাত কম হলে ২-৩ বার সেচ দেয়া প্রয়োজন।

সরগাম কাটার সময় ও ফলন

সরগাম ঘাস প্রথমবার ৫০-৬০ দিনে কাটার উপযুক্ত হয় এবং উপযুক্ত পরিবেশে প্রতি ৩০-৪০ দিনে সংগ্রহ করা যায়। হাইব্রিড জাতের সরগাম একবার চাষ করে ১০-১২ বার সংগ্রহ করা যায়। প্রতিবারে হেক্টর প্রতি ১২০-১৫০ টন ঘাস সংগ্রহ করা যায়। সরগাম থেকে ঘাস সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়।

কাউপি (Cow pea)

জাত

সারসা-১০, রাশিয়ান জায়ান্ট, কে-৩৯৭, কে-৫৮৫ ইত্যাদি।

মাটি ও আবহাওয়া

বেলে দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটিতে কাউপি ভাল জন্মে। জমিতে পানি জমে না থাকলে মার্চ থেকে নভেম্বরের মধ্যে যে কোনো সময় কাউপি চাষ করা যায়। অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে বপনকৃত কাউপি বীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

চাষাবাদ ও সার প্রয়োগ

মাটি ভালোভাবে চাষ করে আকার ছোট করে নিতে হবে। চাষের সময় হেক্টরপ্রতি ৮-১০ টন গোবর সার প্রয়োগ করলেই চলবে। গোবর না পাওয়া গেলে ৫০-৬৫ কেজি ইউরিয়া দেয়া যেতে পারে। মাটিতে ফসফরাস ও পটাশ কম থাকলে হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৫ কেজি ফসফরাস ও ২০-২৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ কেজি বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায়। অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসে ২-৩ বার সেচ প্রয়োগ করা দরকার।

সংগ্রহ, ফলন ও সংরক্ষণ

কাউপি ৫৫-৬০ দিনে সংগ্রহ করা যায়। হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ টন কাউপি ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব। কাউপি 'হে' করে বা খড়ের সাথে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়।

ওট (Oat)

জাত

কেন্ট, আলজেরিয়ান, ফ্লেমিন গোল্ড ইত্যাদি বেশ পরিচিত।

মাটি ও আবহাওয়া

দো-আঁশ বা এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে ওট ঘাস ভাল জন্মে। আমাদের দেশে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস ওট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এদেশের উত্তরাঞ্চলে জানুয়ারি মাসেও ওট বপন করা যেতে পারে।

> প্রতি ১৫-২০ দিন পর পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

চাষাবাদ ও সার প্রয়োগ

প্রথমে ভালো করে ২-৩ বার চাষ দিয়ে মাটি নরম ও ছোট করে নিতে হবে। চাষের সঙ্গে হেক্টরপ্রতি ১০-১৫ টন গোবর ও একইসাথে ৫০-৬০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। গোবর না দিলে হেক্টরপ্রতি ৮০-১০০ কেজি বীজ দরকার হবে। ওট বোনার ৩০ দিনের মাথায় প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ১৫-২০ দিন পর পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। জমির কোথাও যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ফলন ও সংরক্ষণ

পুরো জমির অর্ধেক ফসলে যখন ফল আসবে তখন ওট কাটতে হবে। সাধারণত ৫০-৬০ দিনে এ অবস্থায় আসে। প্রথমবার ওটের ফলন হেক্টরপ্রতি ১৫-২০ টন পাওয়া যায়। উপযুক্ত পরিবেশে আরও দু'বার এ ফসল কাটা যায় ও একইরূপ ফলন পাওয়া যেতে পারে। সংগৃহীত ঘাস রোদে শুকিয়ে 'হে' তৈরি করে বা সাইলেজ তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়।

নেপিয়ার (Napier)

জাত

নেপিয়ার একটি বহুবর্ষজীবি ঘাস। এ ঘাসের উলে- খ্যযোগ্য জাতগুলো হলো নেপিয়ার বাজরা, নেপিয়ার-১৭, নেপিয়ার পুশা ইত্যাদি। সম্প্রতি নেপিয়ার অ্যারোসা নামে একটি উন্নতমানের ঘাস বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে চাষ করা হচ্ছে। নেপিয়ারের অন্যান্য জাতের চেয়ে এটির ফলন তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এর পুষ্টিমানও বেশি।

মাটি ও আবহাওয়া

আর্দ্র ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে নেপিয়ার ঘাস ভালো জন্মে। এদেশে শুষ্ক মৌসুম ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় নেপিয়ার ঘাসের ভালো উৎপাদন হয়।

চাষাবাদ ও সার প্রয়োগ

বৃষ্টি শুরু হলে মে থেকে আগষ্টের যে কোনো সময় নেপিয়ার ঘাস লাগানো যেতে পারে।

শুষ্ক মৌসুমে কয়েকবার চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করে হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ টন গোবর সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গোবর সারের অতিরিক্ত ১০০-১৫০ কেজি/হেক্টর ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। গোবর সার না দিলে ইউরিয়ার মাত্রা চাষের সময় প্রতি হেক্টরে ২০০-২৫০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টি শুরু হলে মে থেকে আগষ্টের যে কোনো সময় নেপিয়ার ঘাস লাগানো যেতে পারে। তবে বৃষ্টির শুরুতে লাগানো ভালো। সাধারণত ৩-৫টি গাছসহ একটি মোথা লাগালে সহজেই ঘাসটি বেড়ে উঠে। ৫০×৫০ সেমি দূরত্বে মোথাগুলো লাগাতে হবে। লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর হেক্টরপ্রতি ২০০-২৫০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

সংগ্রহ, ফলন এবং সংরক্ষণ

জমিতে ঘাস স্থায়ী হওয়ার পর বর্ষা মৌসুমে প্রতি ৪৫-৫০ দিন অন্তর ঘাস কাটা যায়। মাটির উপর ৩০-৩৫ সেমি উচ্চতায় নেপিয়ার ঘাস কাটতে হবে। সুষ্ঠু পরিচর্যার মাধ্যমে ঘাস চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ২২৫-৩০০ টন সবুজ ঘাস সংগ্রহ সম্ভব। উপযুক্ত বয়সে নেপিয়ার ঘাস সংগৃহীত হলে প্রতি কেজি শুষ্ক পদার্থে ৮০-৯০ গ্রাম আমিষ থাকে। নেপিয়ার ঘাস সহজেই চিটাগুড় দিয়ে সাইলেজ তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়। দৈনিক একটি গরুর প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৬ কেজি পরিমাণ ঘাস প্রয়োজন।

প্যারা ঘাস (Para grass)

জাত

প্যারা ঘাসের মধ্যে অন্যতম প্রজাতি হচ্ছে *Btachiaria mutia*। এছাড়া *B. ruziziensis*, *B. brizantha* and *B. decumbens* ইত্যাদি জাতগুলোও ভালো ফলন দেয়।

মাটি ও আবহাওয়া

এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে প্যারা ঘাস ভালো জন্মে। এ ঘাসটি জলাবদ্ধ স্থানসহ উঁচু জায়গায়ও উৎপাদন করা যায়। শুষ্ক মৌসুমে উৎপাদিত হলেও বৃষ্টির মৌসুমেও উৎপাদন ভালো হয়। সমতল, ঢালু বা পাহাড়ি ঢালেও এ ঘাসটি উৎপাদন করা সম্ভব।

চাষাবাদ ও সার প্রয়োগ

জমি কয়েকবার চাষ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আগাছা মুক্ত করতে হবে। তারপর সেচ প্রয়োগ করে মাটি ভালো করে ভেঁজাতে হবে। মে থেকে আগষ্ট মাসে লাগালে সহজেই ঘাসটি জন্মানো সম্ভব। কান্ডের কাটিং বা ২-৩টি চারাসহ একটি গুচ্ছ ব্যবহার করেও প্যারা ঘাস চাষ করা সম্ভব। লতানো স্বভাবের হওয়ায় লাগানোর সময় পুরোপুরি দূরত্ব বজায় না রাখলেও চলে। তবে সাধারণত ঘাসের গুচ্ছগুলো ৫০×৫০ সেমি দূরত্বে লাগানো উচিত। চাষের সময় নেপিয়ার ঘাসের ন্যায় গোবর বা ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে ইউরিয়ার মাত্রা নেপিয়ার সারের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম দিলেও চলবে।

সংগ্রহ, ফলন ও সংরক্ষণ

প্যারা ঘাস গরু ছেড়ে দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে বা সংগ্রহ করা যায়। বছরে হেক্টরপ্রতি ১২০-১৫০ টন পর্যন্ত ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব। বৃষ্টির মৌসুমে প্রতি ৪০-৪৫ দিন পর পর প্যারা ঘাস সংগ্রহ করা যায়। সংগৃহিত ঘাস সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বেশি বয়স করে সংগ্রহ করলে অন্যান্য ঘাসের ন্যায় প্যারা ঘাসের পুষ্টিমানও হ্রাস পায়। সংগৃহীত তাজা ঘাস বা সাইলেজ নেপিয়ারের ন্যায় প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতিদিন ৬ কেজি ঘাসের প্রয়োজন পড়বে।

ইপিল ইপিল (Leucaena spp)

জাত

ইপিল ইপিল-এর আদিনিবাস দক্ষিণ আমেরিকা হলেও এখন সারা পৃথিবীতেই গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইপিল ইপিলের মধ্যে *Leuceana leucocephala*-এর মেক্সিক্যান জাতটি গোখাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

চাষাবাদ ও আবহাওয়া

জলাবদ্ধ ও অ্যাসিড মাটি ব্যতিত প্রায় সব ধরনের জমিতেই ইপিল ইপিল ভালো জন্মে। তবে দো-আঁশ মাটিতে ফলন ভালো হয়। অন্যান্য ঘাসের মতো জমি তৈরি করে গোবর প্রয়োগ করা যেতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে ইপিল ইপিলের উৎপাদন খুবই কম। সেচ প্রয়োগ করলে কিছু ঘাস উৎপাদন সম্ভব। তবে মে থেকে নভেম্বরে ইপিল ইপিল খুব বৃদ্ধি পায়। বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে ৫০×৫০ সেমি দূরত্বে সারি করে চারা লাগানো যায়। এতে করে হেক্টরপ্রতি ৪০,০০০ চারা গাছ দরকার পড়ে। অন্যদিকে, জমি তৈরির পর হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ কেজি বীজ বপন করেও ইপিল ইপিল চাষ করা যায়। ইপিল ইপিল একটি উৎকৃষ্টমানের আমিষজাতীয় গো-খাদ্য। এর পাতায় প্রায় ২৩-২৪% আমিষ থাকে (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে)।

হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ কেজি বীজ বপন করেও ইপিল ইপিল চাষ করা যায়।

সংগ্রহ, ফলন ও সংরক্ষণ

মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ইপিল ইপিল গাছ থেকে প্রতি ৪৫ দিন পর পর কান্ডসহ পাতা সংগ্রহ করা যায়। গাছের ১.৫ মিটার উচ্চতায় নরম ডালপালাসহ পাতা সংগ্রহ করতে হবে। তবে মাটি থেকে গাছের কান্ড ৪-৫ ইঞ্চি রেখে উপরের নরম কান্ড ও পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ অবস্থায় প্রথমবার ৫০-৬০ দিনে এবং পরবর্তীতে প্রতি ৪৫-৫০ দিনে পাতা সংগ্রহ করা যায়। ১.৫ মিটার উচ্চতায় কাটলে বছরে হেক্টরপ্রতি ৪০-৫০ টন সবুজ পাতা পাওয়া যায়। একবার বপনের পর কমপক্ষে পাঁচ বছর পর্যন্ত একটি জমি থেকে পাতা সংগ্রহ করা যাবে। ইপিল ইপিলের পাতা রোদে শুকিয়ে হে করে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা যায়। সবুজ অবস্থায় ইপিল ইপিল পাতা খড়ের সঙ্গে ২৫-৫০% মিশিয়ে খাওয়ানো যাবে। গরুকে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত করে খাওয়ালে ইপিল ইপিলের বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভবনা থাকে না।

সারমর্ম

বিভিন্ন প্রকার আঁশজাতীয় গোখাদ্য অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ঘাস, যেমন- ভূট্টা, কাউপি, ওট, নেপিয়ার, প্যারা ঘাস, ইপিল ইপিল ইত্যাদি চাষ করে গাবাদিপশুর খাদ্য ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব। এসব ঘাস চাষ করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত জাত, মাটি, চাষাবাদ ও চাষ পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইপিল ইপিলের পাতায় শতকরা কত ভাগ আমিষ থাকে?
   ক) ২৩-২৪ ভাগ
   খ) ২৮-৩০ ভাগ
   গ) ৩৫-৪০ ভাগ
   ঘ) ৪০-৪৫ ভাগ

২. কোনটি কাউপির একটি জাত?
   ক) সারসা-১০
   খ) সারসা-২০
   গ) সারসা-২৫
   ঘ) সারসা-৩০

৩. কোনটি ডাল জাতীয় ফরেজ নয়?
   ক) ইপিল ইপিল
   খ) খেসারি
   গ) কাউপি
   ঘ) ধৈঞ্চা

পাঠ ৬.৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদিপশুর খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হে তৈরি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি লিখতে পারবেন।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত গবাদিপশুর খাদ্য বা গোখাদ্যের বেশিরভাগই কৃষি শস্যের উপজাত। এসব উপজাত শস্য মাড়াইয়ের বা শস্যদানা প্রক্রিয়াজাত করার পর পাওয়া যায়। সাধারণত এসব উপজাতগুলোর মধ্যে জলীয় অংশের পরিমাণ ১৫%-এর নিচে থাকে এবং শুকনো অবস্থায়ই এগুলো সংরক্ষণ করা হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

- বর্ষা মৌসুমে মাটিতে জলীয় অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে বা কৃত্রিমভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে যেসব পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয় তাৎক্ষনিকভাবে তা ব্যবহার করা অনেকসময় সম্ভব হয় না। তখন অতিরিক্ত এ ঘাস সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়।
- ঘাসের পরিপক্কতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর পুষ্টিমানও হ্রাস পায়। অতএব অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ ঘাস একসাথে সংগ্রহ করলে সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে।
- অল্প সময়ে ঘাস সংগ্রহ করলে ঐ জমিও পরবর্তী ফসলের জন্য ব্যবহার করা যায়।

আঁশজাতীয় গোখাদ্য সংরক্ষণ দু'ভাবে করা যায়। যথা- 'হে' ও সাইলেজ তৈরি করে। আবহাওয়া বা ঘাসের গঠনের উপর নির্ভর করে উপরোক্ত যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

'হে' (Hay) তৈরি

উদ্দেশ্য

তাজা ও সবুজ ঘাস রোদে বা কৃত্রিম উপায়ে শুকিয়ে জলীয় অংশ এমন একটি মাত্রায় নিয়ে আসা হয় (১০-১৫%) যা ঐ ঘাসের পুষ্টিমানসহ সংরক্ষণ করার উপযোগী হয়। 'হে' তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

> যেসব ঘাসের কান্ড নরম, সহজে শুকানো যায় ও শুকানোর পর সহজে পাতা ঝরে পড়ে না সেসব ঘাস 'হে' করার জন্য নির্বাচন করতে হবে।

- যেসব ঘাসের কান্ড নরম, সহজে শুকানো যায় ও শুকানোর পর সহজে পাতা ঝরে পড়ে না সেসব ঘাস 'হে' করার জন্য নির্বাচন করতে হবে। উদাহরণসরূপ বলা যায় ওট, খেসারি, মাসকালাই ইত্যাদি ঘাস থেকে ভালো 'হে' তৈরি হয়।
- ঘাসের সঠিক পরিপক্কতা নির্ধারণ করতে হবে। ঘাস বেশি পাকা হলে 'হে' ভালো হয় না। সাধারণত নরম ফলসহ 'হে' করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

শুকানোর পদ্ধতি নির্বাচন

- নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কাঁচা ঘাস শুকানোর পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। যেমন-
- কী পরিমাণ ঘাস কোন সময়ে পাওয়া যাচ্ছে
- বাতাসের আর্দ্রতা
- বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা বা পরিমাণ এবং
- দিনের তাপমাত্রা ইত্যাদি

আমাদের দেশে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে, বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ডালজাতীয় অনেক ঘাস উৎপাদিত হয়। তখন এসব ঘাস সহজেই রোদে শুকিয়ে 'হে' তৈরি করা যায়। অন্যদিকে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রোদে শুকানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। এ সময় কৃত্রিমভাবে ঘাস শুকানো যেতে পারে। খামারিদের কাছে সাধারণত যে পরিমাণ ঘাস পাওয়া যায় তা কৃত্রিম উপায়ে শুকানো ব্যয়বহুল।

ভালো হে-এর গুণাগুণ-

- অ্যারোমা গন্ধযুক্ত হবে।
- নির্দিষ্ট জাতের ঘাস ব্যতীত অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় ঘাস বা আবর্জনা থাকবে না।
- মোটামুটিভাবে দেখতে সবুজ মনে হবে।
- ঘাসের পাতা এবং কান্ডের গঠন অটুট থাকবে।
- গবাদিপশু সহজেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।

ঘাসের আর্দ্রতা ১৫-২০%-এর বেশি থাকলে ভালো 'হে' তৈরি করা সম্ভব হয় না।

খারাপ গুণাগুণ সম্পন্ন 'হে'

- ঘাসের আর্দ্রতা ১৫-২০%-এর বেশি থাকলে ভালো 'হে' তৈরি করা সম্ভব হয় না।
- বেশি মাত্রায় আর্দ্রতা থাকলে ছত্রাক (ফাঙ্গাস) বা মোল্ড জন্মায়।
- ঘাস সংগ্রহ ও 'হে' তৈরি সঠিক না হলে পাতা ঝরে যেতে পারে। বৃষ্টির পানি পড়ে ভিজে যেতে পারে এবং অতিরিক্ত শুকানোর ফলে পুড়ে যেয়ে অনেক খাদ্য উপাদান নষ্ট হতে পারে।

'হে' সংরক্ষণ পদ্ধতি

হে তৈরির পর কোনো শেডের নিচে যেভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা নিম্নরূপ:

- স্তুপ করে
- বেল বা বোঝা বানিয়ে
- কেটে ও স্তুপ করে
- পিলেট করে ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়
- কেটে চৌকোনা ব্লক করে সংরক্ষণ করা যায়

এছাড়া বেল বা চৌকোনা ব্লক পলিথিন দিয়ে মুড়ে বাইরে পাকা মেঝেতে রাখা যেতে পারে।

'হে' প্রিজারভেটিভ ব্যবহার

ভালো 'হে' তৈরির জন্য ঘাসে সাধারণত ১০-১৫% জলীয় অংশ থাকা প্রয়োজন। ঘাসে জলীয় অংশের পরিমাণ ১৫% বা তারও বেশি রেখে সংরক্ষণ করার জন্য 'হে প্রিজারভেটিভ' হিসেবে সোডিয়াম অ্যাসিটেট, প্রপিওনিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যবহার করা যায়। জলীয় অংশ বেশি থাকার ফলে ঘাসের পাতা ভেঙ্গে নষ্ট হয় না, সহজে বেল করা যায় এবং ফাঙ্গাস বা মোল্ড ধরে না।

বায়ুনিরোধক স্থানে (সাইলো) সংরক্ষিত ঘাসকে সাইলেজ বলে।

সাইলেজ তৈরি

বায়ুনিরোধক স্থানে (সাইলো) সংরক্ষিত ঘাসকে সাইলেজ বলে। সাইলেজ তৈরির প্রক্রিয়াকে অ্যানসাইলেজিং বলে। সাধারণত তাজা ও সবুজ ঘাস সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতিটি ব্যবহার হয়। সাইলেজ তৈরির জন্য একটি বায়ুনিরোধক বা মোটামুটিভাবে বায়ু চলাচল করতে পারে না এমন ধরনের ধারককে সাইলো বলে।

সাইলোর প্রকারভেদ-

- ট্রেন্স সাইলো
- বাংকার সাইলো
- টাওয়ার সাইলো

ট্রেন্স সাইলো

উঁচু জায়গা বা পাহাড়ের ঢালে মাটি খুঁড়ে ট্রেন্স্ সাইলো তৈরি করা হয়। এ ধরনের সাইলো মাটির গর্তের তলা থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিক প্রশস্ত হয়। গর্তের দৈর্ঘ্য ঘাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। গর্তের তলা বা পার্শ্বগুলো খড়কুটো দিয় ঢেকে বা পাকা করেও সাইলেজ তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

বাংকার সাইলো

এ ধরনের সাইলো মাটির উপরে কাঠের বা প্লাস্টিকের দেয়াল তৈরি করে করা হয়। ট্রেন্স সাইলো মাটির নিচে গর্ত করে আর বাংকার সাইলো মাটির উপরে তৈরি করা হয়। দু'ধরনের সাইলোর মধ্যে এটিই মূল পার্থক্য।

যেসব ঘাসের মধ্যে পরিমাণমতো জলীয় অংশ (৬০-৭০%), সহজপাচ্য শর্করা ও অন্যান্য খাদ্যোপাদান থাকে ও সহজে গাঁদানো (Packing) যায় তা সাইলেজ করার জন্য ব্যবহার করা যায়।

টাওয়ার সাইলো

টাওয়ার সাইলো আয়াতকার করে মাটির উপরে তৈরি করা হয়। এটি বেশ ব্যয়বহুল।

কী ধরনের ঘাস সাইলেজ করা যায়

যেসব ঘাসের মধ্যে পরিমাণমতো জলীয় অংশ (৬০-৭০%), সহজপাচ্য শর্করা ও অন্যান্য খাদ্যোপাদান থাকে ও সহজে গাঁদানো (Packing) যায় তা সাইলেজ করার জন্য ব্যবহার করা যায়। অ-ডালজাতীয় ঘাস, যেমন- ভূট্টা, সরগাম স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়। সংরক্ষণের জন্য চিটাগুড় ঘাসের ওজনের ২-৩% ব্যবহার করতে হবে।

কীভাবে সাইলেজ তৈরি হয়

তাজা ও সবুজ ঘাস সুন্দর করে গাঁদানো হয় যাতে ঘাসের ফাঁকে কোনো বাতাস না থাকে। যতটুকু বাতাস থাকে তার অক্সিজেন ব্যবহার করে ঘাসের শর্করা থেকে পানি, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। এ তাপে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে বিভিন্ন প্রকার শর্করা ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত

ল্যাকটিক অ্যাসিড ঘাসের পিএইচ হ্রাস করে ঘাসের পচন বন্ধ করে ও ঘাস সংরক্ষিত হয়। সাইলোর ভিতর কোন প্রকারে বাতাস প্রবেশ করলে পুনরায় পচন শুরু হয়।

সাইলেজ অ্যাডিটিভ

সাইলেজে গাঁজন প্রক্রিয়া দমন বা তরান্বিত করার জন্য অ্যাডিটিভ ব্যবহার করা হয়। ফরমিক বা প্রপিওনিক অ্যাসিড যোগ করে গাঁজন প্রক্রিয়া দমন করে ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে চিটাগুড়, শস্য ভাঙ্গা ইত্যাদি ব্যবহার করে গাঁজন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা যায় ও পরিমিত পরিবেশে ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।

সারমর্ম

এদেশে আঁশজাতীয় গোখাদ্যকে দু'ভাবে সংরক্ষণ করা যায়, যথা- হে ও সাইলেজ তৈরি করে। তাজা ও সবুজ ঘাস রোদে বা কৃত্রিমভাবে শুকিয়ে পুষ্টিমানসহ সংরক্ষণ করা যায়। এ ঘাসকে হে বলে। আবার বায়ু নিরোধক স্থানে সংরক্ষিত ঘাসকে সাইলেজ বলে। সাইলেজ তৈরির প্রক্রিয়াকে অ্যানসাইলেজিং বলে। সাইলেজ তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের সাইলো ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আমাদের দেশে কোন সময়ে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে?
   ক) নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত   খ) জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত
   গ) জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত   ঘ) এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত

২. বায়ু নিরোধক স্থানে সংরক্ষিত ঘাসকে কী বলে?
   ক) হে   খ) সাইলেজ
   গ) স্ট্র   ঘ) ড্রাই ঘাস

৩. সাইলেজ করার জন্য ঘাসে কী পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকা প্রয়োজন?
   ক) ৩০-৪০%   খ) ৪০-৫০%
   গ) ৫০-৬৫%   ঘ) ৬০-৭০%

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৬

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য ও পুষ্টি কী? খাদ্যের কাজ বর্ণনা করুন।
২. রেশন কী? একটি আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩. রেশন তৈরির বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করুন।
৪. রোমন্থক প্রাণিতে শর্করার পরিপাক প্রণালী বর্ণনা করুন।
৫. ফরেজ কী? ফরেজের শ্রেণিবিভাগ প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করুন।
৬. ভূট্টার বপন প্রণালী বর্ণনা করুন।
৭. নেপিয়ার ঘাসের চাষ ও সার প্রয়োগ উল্লেখ করুন।
৮. ইপিল ইপিল পাতার ব্যবহার লিখুন।
৯. হে ও সাইলেজ কী?
১০. বিভিন্ন প্রকার সাইলোর বর্ণনা দিন।